অমাবস্যার চাঁদ

যুথিকা বড়ুয়া

(এক)

বসন্তের পড়ন্ত দূপুর। প্রকৃতির কি নিদারুণ বৈচিত্র্যময় রূপ! একটুও মেঘ নেই আকাশে। সোনালী রৌদ্রে ঝলমল করছে চারদিক। সুপবনও আমোদিত হয়ে আছে পথের প্রান্তে ফুটে থাকা রং-বেরং-এর ফুলের মধুর সুরভীতে। বইছে ঝুরুঝুরু মিহিন বাতাস। কখনো শন্‌শন্‌ শব্দে সুস্পষ্ট গুঞ্জন ভরা বাতাস নির্জন প্রান্তর জুড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। যেন আলো-বাতাসের লুকোচুরি খেলা। দূরে গ্রামোফোন রেকর্ড বাজজে, শোনা যাচ্ছে। চলছে একটার পর একটা হারানো দিনের বাংলা গান। বেশ আনন্দোৎচ্ছলসমারোহে ছেয়ে গিয়ে সৃষ্টি হয়,এক মনোরম পরিবেশ, অপূর্ব! অথচ বিকেল থেকে মনটা বড্ড আনচান করছে সুচরিতার। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। গিয়ে দাঁড়ায় ছাদের কার্ণিশ ঘেষে গজিয়ে ওঠা বিশাল কদমগাছের ছায়ায়। হঠাৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, পশ্চিম প্রান্তে অস্তাচলে ডুবে যাওয়া ক্লান্ত কুসুমের মতো রক্তিম সূর্য্যের দিকে। চেয়ে থাকে পলকহীন নেত্রে। আর একটানা দেখতে দেখতে ওর মধ্যে এক ধরণের প্রতিক্রিয়া ঘটে। প্রচন্ড রেখাপাত করে। মনে মনে ভাবে, ওর জীবন প্রদ্বীপও যেন সূর্য্যের মতো ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসছে। মুহূর্তে বিষন্নতায় ছেয়ে গেল মন-প্রাণ-সারাশরীর। হারিয়ে যায় ওর নিজস্ব জগতে। কল্পনায় বিচরণ করে, মরচে ধরা স্মৃতির মনিমেলায়। হাতরে হাতরে খুঁজে বেড়ায়, পিছনে ফেলে আসা হাসি-কলোতানের সেই আনন্দমুখরিত দিনগুলি।

দেখতে দেখতে বৈবাহিক জীবনের কতগুলি বছর কেটে গেল সুচরিতার। যৌবন পেরিয়ে আজ ও' প্রৌঢ়ত্বে এসে ঠেকেছে। অথচ ওর রূপ-রং, সৌন্দর্য্যের লাবণ্যতা, শরীরের গড়ন ও কোমল মসৃণ তক্‌ যেন তারুণ্যের জোয়ারে ভাসছে! নব যৌবনসম্পন্না যুবতী তন্বিকেও হার মানাবে! কিন্তু তাতে কিইবা এসে যায়! কত বসন্তই না এলো আর গেল! ওর এমনতরো সৌন্দর্য্যের কদর আর পেলো কই! কথায় বলে,-"মেয়েরা কুড়ি হলেই বুড়ি!"

ভিতরে ভিতরে সুচরিতা কবে বুড়ি হয়ে গেছে! মনের জোরও কমে এসেছে। এবার ওর সত্যিই বুড়িয়ে যাবার পালা। শরীরের আদ্রতা কমে এলেই কুঁচকে আসবে ওর দুধসাদা মসৃণ তক্‌। নোনামাটির মতো ঝড়ে যাবে ওর রূপ, রং, সৌন্দর্য্য। কালি পড়ে যাবে চোখের কোলে। ক্রমে ক্রমে রোগের বাসা বাঁধবে। দুর্বল হয়ে পড়বে। ভেঙ্গে যাবে শরীরের বাঁধন, ইচ্ছা শক্তি। দেখতে দেখতে একদিন ওও সুরভীত ফুলের মতো নিঃশ্ব হয়ে ঝরে যাবে। তার পর রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে থাকবে বিছানায়।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল সুচরিতা। ঠোঁটের কোণে একটা বিষন্ন হাসি ফুটিয়ে মনে মনে ভাবে, হুঁম, অযথা অন্যকে দোষারোপ করা! ন্যায়-অন্যায়ের দাড়িপাল্লায় নিজের ভাগ্যকে যাচাই করা! আসলে সবই অদৃষ্ট!

পঁয়তাল্লিশের উর্দ্ধেঃ বয়স সুচরিতার। জীবনের প্রায় অর্থেকটা পেরিয়ে এসেছে, কিংম্বা তারও বেশী। এখনো সাধ-আহাল্লাদ কিছুই পূরণ হয় নি! জীবনে অর্থ-ঐশ্বর্য্যই কি সব! আর যাই হোক, অন্তত মনের সুখ-শান্তি কখনো কেনা যায় না। হিসেব কষলে দেখা যায়, যোগ-বিয়োগ সব শূন্য। কত আশা ছিল, কত স্বপ্ন ছিল ওর! কিন্তু বিধির বামে তা কিছুই পূরণ হয়নি, পূরণ করতে পারেনি! যেদিন প্রসবকালীন জটিলতার অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে একটি মৃত কন্যা সন্তানের জন্ম লগ্নেই ওর চিরতরে হারিয়ে গেল, সন্তান ধারণের ক্ষমতা। আর সেইদিন থেকেই নারীজাতির পরম কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন এবং মধুচন্দ্রিমার আনন্দময় মধুর রজনী আর ফিরে আসে নি ওর জীবনে! ফিরে আসেনি, দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি এবং অন্তরঙ্গ আলাপনের সেই আনন্দঘন মুহূর্ত! ভাগ্যবিড়ম্বণায় প্রাত্যহিক

জীবনের এক একটি দিন কেমন নিরুচ্ছাস, নিস্প্রেম, নিরানন্দে কাটে সুচরিতার! কোনো ইচ্ছা-আবেগ, অনুভূতি কিছুই নেই! কি শীত, গ্রীস্ম, বর্ষা, জীবনতড়ী বারোমাস একইধারায় বইছে। কোনো পরিবর্তন নেই, পরিবর্তনের সম্ভবনাও নেই!

স্বামী দিব্যেন্দু উদয়াস্থ রুগীর সেবায় ডুবে থাকে। নিজেকে ব্যস্ত রাখে। সুচরিতাও নার্সারীস্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে ভুলে থাকে, সন্তানহীনতার যন্ত্রণা, মাতৃত্বহীনতার যন্ত্রণা! ভুলে থাকে, বন্ধা নারীর কলঙ্ক, অপবাদ! যা আজও ওকে পিছু পিছু ধাওয়া করে, অপদস্থ করে! আর তা থেকে নিস্তার পেতে হৃদয় নিঃসৃত স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা বিতড়ণে নিমজ্জিত হয়ে পূরণ করার চেষ্টা করে, মা হওয়ার সাধ।

কিন্তু এসব নিয়ে আজকাল আর মাথা ঘামায় না সুচরিতা। কোনো ভাবান্তরও হয়না। ধাতস্থ হয়ে গেছে। আজ ও' নিয়তির কাছেই আত্ম সমর্পিত, নিমজ্জিত, বিসর্জিত। মনবাসনার প্রকোষ্ঠে কারাবন্দি। ওর অতীত, বর্তমান সবই নিজের ভাগ্য হিসেবে মেনে নিয়েছে। তবু মন মানে না, যদি আবেগ, উচ্ছাসহীন দিব্যেন্দুর বিষন্ন মুখে একঝলক অনিন্দ্য হাসি ফিরিয়ে দিতে পারতো, তাতে এতটুকু দুঃখ ছিলনা। কেমন যন্ত্রের মতো হয়ে গেছে দিব্যেন্দু। এ্যাঁ উঁ ছাড়া একটা শব্দও ওর উচ্চারিত হয় না। ব্যক্তিগত কর্মজীবনে সক্রিয় থাকলেও প্রণয়মূলক ব্যাপারে ওর এতটুকু আগ্রহ নেই, উৎসাহ নেই, উদ্দীপণা নেই, আবেগ, ইচ্ছানুভূতি কিছুই নেই! কিন্তু এসব কথা সুচরিতা বলবে কাকে!

আগামী রবিবার, ৮ই বৈশাখ, সুচরিতার ১৫তম বিবাহ বার্ষিকী। ইচ্ছা হয়, জীবনকে নতুন রংএ, নতুন ঢংএ নতুন করে সাজাতে। জীবনকে নতুন করে ফিরে পেতে। প্রিয়তম স্বামী দিব্যেন্দুকে একান্তে নিঃভৃতে নিবিড় করে কাছে পেতে। ওর গহীন ভালোবাসার অবগাহনে নিমজ্জিত হয়ে বুদ হয়ে থাকতে। অথচ সেদিকে দিব্যেন্দুর ভ্রুক্ষেপই নেই! আর কোনকালেই বা ছিল! দিব্যেন্দু একজন বিলেত ফেরৎ মেডিক্যাল ডাক্তার, চাইল্ড্ স্পেশালিষ্ট। নিজের চেম্বারে সারাদিন রুগী নিয়ে পড়ে থাকে। রুগীর সেবা-শুশ্রূষা করে। হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবেই মনের আক্ষেপ, অভিমান ভুলে থাকার চেষ্টা করে!

সাধারণতঃ কর্মজীবনে মানব সেবাতেই দিব্যেন্দুর দিন যায়, রাত পোহায়। দিনের শেষে ক্লান্তিময় সূর্য্য অস্তাচলে ঢলে পড়ে কখন যে সন্ধ্যে পেরিয়ে বাইরের পৃথিবী অন্ধকারে ছেয়ে যায়, ওর বোধগম্যই হয় না! অবিরাম রুগীর চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষায় নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-আনন্দ-উচ্ছাসে বহুদিন আগেই ভাটা পড়ে গেছে! অন্তত কর্মক্লান্ত দিনের শেষে দুজনে পাশাপাশি বসে জীবনের আনন্দ-বেদনা শেয়ার করা, একসাথে বসে ডিনার করা তো দূর, বাড়িতে যে ফিরতে হবে, ওর অপেক্ষায় সুচরিতা পথ চেয়ে বসে থাকবে, সে চিন্তাই কখনো হয় না! যার ফলে উভয় উভয়ের সান্নিধ্যে নির্লিপ্ততার কারণে ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে, দুটি আত্মার একতা, ঘনিষ্ঠতা, হৃদ্যতা ও পরম আত্মীয়তা। অচীরেই বেড়ে যায় মানসিক দূরত্ব। যেদিন থেকে আপন স্বার্থে মান-অভিমানের দ্বন্ধে ও বিবাদে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি, প্রেম-ভালোবাসা এবং দাম্পত্য জীবনের মূল্যবোধের শিকড় হৃদয়ের গভীরে পোঁছাবার আগেই ছিঁড়তে শুরু করেছিল।

ভাবতে ভাবতে কখন যে আকাশের গায়ে সন্ধ্যে ঢলে পড়েছে, এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না সুচরিতার। হঠাৎ গাড়ির শব্দ শুনে চমকে ওঠে। গলা টেনে দ্যাখে, নিচে গেটের সামনে পর পর দুটো গাড়ি এসে দাঁড়ালো। কিন্তু আবছা অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারলো না! ভাবল, পাশের ফ্ল্যাটের কেউ হবে হয়ত! এই ভেবে পিছন ফিরতেই ভূত দেখার মতো সারাশরীর ওর কেঁপে ওঠে। -এ কি, দিব্যেন্দু যে!
একই সঙ্গে দিব্যেন্দু বলল,-"ঋতু, তুমি এখানে! সন্ধ্যেবেলায় ছাদে কি করছ? গাড়ির আওয়াজ শুনতে পাও নি?"

অপ্রত্যাশিত দিব্যেন্দুর গলা শুনে অপ্রস্তুত সুচরিতা বিস্ময় আর আনন্দের সংমিশ্রণে মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে। চোখদুটোকে বিশ্বাসই হয় না! ভাবল, ওর ভ্রম নয়তো! দিব্যেন্দু আজ অসময়ে, বিনা নোটিশে! সারাবাড়ি ডিঙ্গিয়ে সরাসরি একেবারে ছাদে উঠে এসেছে যে! হোয়াট এ সারপ্রাইজড! ভাবতেই অবাক লাগছে ওর!

ইতিপূর্বে ওর চেহারার ব্যাতিক্রম লক্ষ্য করে সবিস্ময়ে দিব্যেন্দু বলল,-"হোয়াট হ্যাপেন্ড ঋতু! আর ইউ ওকে?" এমন স্বাভাবিক গলায় বলল, যেন কত ভাব-ভালোবাসা দুজনের!

দৃষ্টি বিনিময় হতেই ঠোঁটের কোণে একটা শুকনো হাসির রেখা ফুটিয়ে সুচরিতা বলল,-"এতো আর্লি কখনো তো ব্যাক্ করো না দেব! রাত দশটার আগে তোমার দর্শণই পাওয়া যায়না কোনদিন! আজ যে আকাশের চাঁদটাই স্বয়ং আমার সন্নিকটে নেমে আসবে, তা জানবো কেমন করে বলো! এ তো স্বপ্নেরও অতীত! তা হঠাৎ, কোনো দরকারে বুঝি!"

বিদ্যুতের মতো একফালি হাসির ঝিলিক দিয়ে উঠতেই হাসিটা মিলিয়ে গেল দিব্যেন্দুর। অসন্তোষ হয়ে বলল,-"নাঃ, কিছু না! বিকেল থেকে কোনো পেশেন্ট নেই, বোর ফিল করছিলাম! তাই চলে এলাম! আর তা ছাড়া....!"

বলতে গিয়েও থেমে গেল দিব্যেন্দু। মাথা চুলকোতে চুলকোতে সুচরিতার মুখপানে একপলক দৃষ্টিপাত করেই দ্রুত নেমে গেল নিচে। আজ ও' প্যান করেই এসেছে, এবার বিবাহ বার্ষিকীতে সুচরিতাকে ডবল সারপ্রাইজ দেবে। যা কোনদিনও দেয়নি! এতক্ষণ ও' সেটাই ভাবছিল ক্লিনিকে বসে বসে। কিন্তু সেটা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি সুচরিতা। আকস্মিক দিব্যেন্দুর অভাবনীয় পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হতেই পড়ে যায় বিস্ময়ের ঘোরে। মন-মেজাজ ওর খুবই সুপ্রসন্ন! চোখমুখ থেকেও ঝড়ে পড়ছে উচ্ছাস! স্ফূর্তিতে মনযমুনা একেবারে টগবগ করছে! এমন ভাবমূর্তি ওর কতকাল দেখেনি সুচরিতা। কিন্তু দিব্যেন্দু কিছু যে একটা লুকোচ্ছে, তা আর বোঝার অপেক্ষা রাখে না।

কথা না বাড়িয়ে সুচরিতাও নীচে নেমে আসে পিছে পিছে। নেমেই ঢুকে পড়ে কিচেররুমে। যথারীতি শুরু হয়ে যায় ওর সান্ধ্যকালীন কার্যক্রম। স্প্যাশালি দিব্যেন্দুর জন্যে। ততক্ষণে দিব্যেন্দুও মুখ-হাত-পা ধুয়ে পা টান টান করে বিছানায় শুয়ে সংবাদ-বিচিত্রা দেখছিল টিভিতে। কিন্তু সুযোগ খুঁজছিল, সারপ্রাইজটা ও' দেবে কেমন করে!

ইতিমধ্যে চা-জল খাবার নিয়ে ঢোকে সুচরিতা। বিছানার পাশের ছোট্ট টি-টেবিলে রেখে পিছন ফিরতেই দিব্যেন্দুর প্রেম আহ্বানে চমকে ওঠে। -"ও কি, যাচ্ছো কোথায়! বসো!"

থমকে দাঁড়ায় সুচরিতা। থ্ হয়ে যায় শুনে। যা ক্ষণপূর্বেও কল্পনা করেনি। চোখে-মুখের অদ্ভুদ অবয়বে দিব্যেন্দুর আপাদমস্তক নজর বুলিয়ে ভাবে, এতকাল পর আজ হঠাৎ এ কি শুনলো ও'! ওর ভীমরতি ধরলো না কি!

ইত্যবসরে ওর হাতদুটো টেনে ধরে দিব্যেন্দু। প্রসন্ন হয়ে বলল,-"আরে, এতো কি ভাবছ! আমি আমার স্ত্রীকেই বলছি! বসো তো, বসো! কথা আছে!"

ইতিমধ্যে টেলিফোনটা ঝন্ঝন্ করে বেজে ওঠে। দিব্যেন্দু রিসিভারটা তুলে ধরতেই ওপাশ থেকে ভেসে আসে, পুরুষ কণ্ঠস্বর। -"হায় দেব, হোয়াটস্ আপ?"

দিব্যেন্দু বলল, -"হু ইস্ দিস্?"

-"সে কি রে, চিনতে পারলি নে! আমি জয়ন্ত!" কিছুক্ষণ থেমে বলল,-"ব্যাপার কি কলতো! আজকাল পাত্তাই পাওয়া যায়না! কই, রিতা ম্যাডাম কোথায়? পতী সেবায় ব্যস্ত বুঝি! সত্যি মাইরি, বড় ভাগ্যবান তুই! নইলে আজকাল এই আধুনিক যুগে এমন পতীব্রতা স্ত্রী পাওয়া বড়ই দুর্লভ! তা সারাদিন ওকে বাড়িতেই বন্দী করে রাখিস বুঝি!"

কথাগুলো আন্তরিকতার সাথে এতো অনায়াসে বলল, যেন দিব্যেন্দুই ওর ক্লোজ ফ্রেন্ড! ক্লাসমেট হলেও জয়ন্তর সাথে তেমন ঘনিষ্ঠতা কোনদিনই ওর ছিল না।

কিছুক্ষণ থেমে দিব্যেন্দু বলল,-"বাঃ! বন্ধুর ওকালতি করছিস তো বেশ! বন্দি করে রাখবো কেন ভাই! সংসারে প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে! আছে নিজস্ব একটা জগত! তাতে আমি কখনোই ইন্টারফেয়ার করি না! ওর ব্যক্তিগত স্বাধীনতায়ও আমি কখনো বাঁধা দিই না! এবার তো মনস্থির করেছি, সমুদ্র সৈকতে যাবো! আসছে রবিবার ভোর সকালেই আমরা রওনা হচ্ছি!"

শুনে বিস্মিত চোখে তাকায় সুচরিতা। চাপা উত্তেজিত হয়ে বলল,-"তুমি সমুদ্র সৈকতে যাবে, কই, একবারও তো আমায় বলো নি!"
বলে দিব্যেন্দুর হাত থেকে রিসিভারটা ঝট্ করে কেড়ে নিয়ে লাইনটা দিলো। খানিকটা অভিমানী সুরে বলল,-"হুঁমঃ যৌবন পার করে এই বুড়ো বয়সে যাবে সমুদ্র সৈকতে? সেখানে সব কচি কচি যুগলবন্দিদের ভীড়, প্রতিটা স্পটে ওদের আড্ডা! গিয়ে করবে কি শুনি!"

অপ্রত্যাশিত বিরোধীমূলক বাক্য শ্রবণে অপ্রস্তুত দিব্যেন্দু মুহূর্তের জন্য স্পীচ্লেস হয়ে অস্বস্তিবোধ করে। অসহায় চোখে তাকায়। হঠাৎ বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো ঠোঁটের কোণে অদ্ভুদ একটা হাসির রেখা ফুটিয়ে অভিযোগের সুরে বলে ওঠে,-"কি করবো মানে! আমরা এন্জয় করবো, রোমান্স করবো, সেখানকার হোটেল স্নো-ফক্স-এর গেষ্ঠ-হাউজে থাকবো, দুজনে কেবিনে বসে লাঞ্চ করবো, ডিনার করবো, এ্যাক্সেট্রা, এ্যাক্সেট্রা! এন্জয় করবার আবার বয়স আছে না কি! দোহাই তোমায়! ওভাবে চেয়ে থেকো না! একটু বোঝার চেষ্টা করো!"

সুচরিতার কাঁধে হাত রেখে নরম হয়ে বলল,-"তোমার অভাবটা আমি বুঝতে পাচ্ছি ঋতু! কিন্তু তুমিতো একা নও! রক্তে-মাংসে গড়া আমিও একজন মানুষ! সাধ-আহাল্লাদ আমারও আছে! ইচ্ছে-আবেগ-অনুভূতি সবই আছে! মনে কষ্ট আমি কি পাইনি ভেবেছ! আজ স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই! দিনের পর দিন কামনা-বাসনার গলা টিপে জীবনের সব সুখ-আনন্দ বিসর্জন দিয়ে আমরা নিজেরাই নিজেদের বঞ্চিত করেছি, পদে পদে অপদস্থ হয়েছি। অপরাধের মানদন্ডে দন্ডিত করে আমরা একে অন্যের সংস্পর্শ থেকে পৃথক হয়ে মনোবৃত্তিকে তিক্ত-বিষাক্ত করে তুলে ছিলাম। অথচ ভিতরে ভিতরে যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছি তুমি আমি, আমরা দুজনেই! কি, হই নি! একান্তে নীরবে অশ্রুপাত করে কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছ, তা টের পায়নি ভেবেছ! তোমরা মেয়েরা কাঁন্নাকাটি করে মনের কষ্টগুলিকে অনায়াসেই হাল্কা করে নিতে পারো! কিন্তু আমরা পুরুষ মানুষরা তা পারি না! তাই বাইরে থেকে তোমরা বুঝতে পারো না!"

ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে,-"হোয়াটএভার! ইউ নিড টু ফরগেট ইট্ নাউ, ফর এভার! তোমার কি ইচ্ছে করে না, জীবনকে নতুন করে ফিরে পেতে, নতুন করে সাজাতে! সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি ঋতু! আদর-স্নেহ-মমতা, প্রেম-ভালোবাসা তরতাজা ফুলের মতোই মানুষের হৃদয় প্রাঙ্গনে আজীবন বিরাজ করে, করবেও! কি, করে না, বলো! পারবে অস্বীকার করতে! খামাখা জেদের বশীভূত হয়ে অতীতকে আঁকড়ে ধরে নিজেদের কেন আর মিছিমিছি কষ্ট দেওয়া, বলো! চলো, আমরা কিছুদিনের জন্য সমুদ্র-সৈকতে কাটিয়ে আসি! দেখবে, পৃথিবীটা কত সন্দুর! আর কোনো কিন্তু নয়! কাম-অন ঋতু, কাম-অন!"

বলে সুচরিতাকে সজোরে আলিঙ্গনে বেঁধে নেয়।

(দুই)

এ যেন স্বপ্নেরও অতীত! দীর্ঘ পনেরো বছর পর সামার ভেকেশনে যাবার সীমাহীন আনন্দে উৎফুল্ল ওঠে সুচরিতা। শুকনো মরুভূমির বুক আচমকা বৃষ্টিতে ভিজে যাবার মতোই অব্যক্ত ভালোলাগার মধুর আবেশে হৃদয়পটভূমিও ওর সিক্ত হয়ে ওঠে। চোখেমুখ থেকেও ঝরে পড়ে উচ্ছাস, আবেগ। নতুন করে জাগ্রত হয় বেঁচে থাকার সাধ। দেহে এবং মনে পুলক জেগে ওঠে। যেদিকে দুচোখ যায়, সবই নতুন লাগে। পূর্ব পরিকল্পিত অনুযায়ী আসন্ন শুভক্ষণের আশায় গুন গুন সুরের অপূর্ব মূর্ছণায় শুরু হয়ে যায় ওর অবকাশ যাপনের প্রস্তুতিপর্ব।

অচীরেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এসে গেল ঊষার প্রথম কোমল নির্মল সূর্য্যের আনন্দময় একটি উজ্জ্বল সকাল। যেন সমস্ত মানুষগুলিকে অভিবাদন জানাচ্ছে আর অকুণ্ঠভাবে আহ্বান করছে, স্বতঃস্ফূর্ত মনে উল্কার মতো দ্রুত কক্ষচ্যুত হয়ে ঝলমলে রূপালী সূর্য্যকিরণে ভেসে যাওয়া কোনো এক প্রান্তরে চলে আসার জন্য।

সবুর সয়না দিব্যেন্দুর। একটানা বিরূপ ব্যতিক্রম জীবন নদীর খেয়া বইতে বইতে ক্লান্ত পথিকের মতো থমকে যাওয়া দিব্যেন্দু আজ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। উচ্ছাসে একেবারে উতল। প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্যের উন্মাদনায় স্বতঃস্ফূর্ত মনে স্বস্ত্রীক বেরিয়ে পড়ে সমুদ্র-সৈকতে। পাশাপাশি সীটে বসে প্রিয়তমা সুচরিতার কোমল সান্নিধ্যের অবগাহনে ওর নতুন করে সৃষ্টি হয়, এক অভিনব অনুভূতির তীব্র জাগরণ। যা ওকে ক্রমশ উৎসুক্য করে তোলে। প্রিয়ার মসৃণ পৃষ্ঠদেশে মৃদুস্পর্শে হস্ত সঞ্চালণ করতে করতে প্রাণবন্ত উচ্ছাসে ড্রাইভ করে যাচ্ছিল। যেতে হবে বহুদূর, মনগড়া এক স্বপ্নের রাজ্যে। যেখানে ওরা দুজনই হবে একমাত্র বাসিন্দা।
কথায় কথায় প্রথম দর্শণের অব্যক্ত ভালোলাগা আর ভালোবাসার অনবদ্য স্মৃতি রোমন্থনে দুজনেই মর্শগুল। কত কথা, কথার আলাপন, বিশ্লেষণ, কত গল্প সুচরিতার! গুনগুন সুরে বাতাসে ভাসছে, অপূর্ব রবীন্দ্র সঙ্গীতের মূর্ছণা। "মোর বীনা ওঠে কোন্ সুরে বাজি, কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে। মোর বীনা ওঠে কোন্ সুরে বাজি!"

ততক্ষণে বেলা গড়িয়ে ক্লান্ত সূর্য্য অস্তাচলে ঢলে পড়েছে। আরো কিছুটা পথ বাকী! তারপরই জীবনে প্রথম সমুদ্র সৈকতের অনাবিল আনন্দ উপভোগে মেতে উঠবে ওরা দুজনে! কিন্তু বিধিই বাম! তাঁর মঞ্জুর হলো না! হঠাৎ কোথা থেকে কালো মেঘ ধেয়ে এসে ঢেকে ফেলল গোটা আকাশ। তার পরক্ষণেই শুরু হয় প্রবল ঝড়-তুফান। রাজ্যের ধূলোবালি উড়িয়ে, গাছের ডালপালা ভেঙ্গে মুছড়ে সে একেবারে প্রলয়ঙ্করী বেগে ছুটে চলে দ্বিগ্বিদিকে। মুহূর্তেই ধোঁয়ার মতো ক্ষীন আবরণে ছেয়ে গেল চারিদিক। সেই সঙ্গে গুড়ুম গুড়ুম মেঘের গর্জন। বিদ্যুতের বাঁকা ঝিলিক। রাস্তার দুধারে গজিয়ে ওঠে লতাপাতাগুলি বাতাসের ধাক্কায় আঁছড়ে পড়ছে রাস্তায়। চোখে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। চারদিক জন মানব শূন্য। একটা প্রাণীও নেই কোথাও। আশে-পাশে না আছে কোনো বিশ্রামাগার, না আছে ফিরে যাবার পথ। এমতবস্থায় বিপদ অবশ্যম্ভাবী। যেন বিশাল একটা দৈত্য ওদের দিকে ছুটে আসছে চন্দ্র গ্রহণের মতো গিলে খাওয়ার জন্য। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন, খন্ডাবে কে! অবলীলায় এক লহমায় নিমর্মভাবেই ঘনিয়ে এলো দিব্যেন্দু -সুচরিতার ভাগ্যবিড়ম্বণার অনিবার্য পরিণতি।

হঠাৎ গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বিশাল মালবাহী ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে মুহূর্তের আর্তচিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই যেন স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা পৃথিবী। চিরদিনের মতো রুদ্ধ হয়ে গেল, সুচরিতার শ্রুতিমধুর কোমল কণ্ঠস্বর। ওর আনন্দ, হাসি-কলোতান, গুঞ্জরণ!

কি অসহনীয় হৃদয়বিদারক সেই দৃশ্য! ডাঙ্গায় ওঠা মাছের মতো অসহায়ভাবে ছট্‌পট্ করতে করতে সেন্সলেস হয়ে পড়ে যন্ত্রণাকাতর সুচরিতা। গলগল করে ফিনকি দিয়ে ছুটতে লাগল রক্তের স্রোত। মুহূর্তে রক্ত বন্যায় ভেসে গেল গোটা রাস্তা। ওদিকে মুমূর্ষ্যু দিব্যেন্দুও গুরুতরোভাবে ঘায়েল হয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। উঠে দাঁড়াবে, সেই শক্তিটুকুও

তখন ওর ছিল না। ঘাঁড় ঘুরিয়ে পাশ ফিরতেই বুকের পাঁজরখানা যেন ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ শোকে বিহ্বলে আর্তনাদ করে ওঠে,-"ওঃ নো! আই ক্যান্ট সী হার ফেইস! আই ক্যান্ট!"
বলেই বুদ্ধিভ্রষ্ঠ হয়ে পাথরের মতো শক্ত হয়ে বীভৎস সুচরিতার রক্তাক্ত দেহটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। একটা শব্দও উচ্চারিত হয় না। চেনাই যাচ্ছে না ওকে! অথচ মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধান। এ কেমন বিধাতার দু'টি মানব-মানবীকে প্রাণের ডোর বেঁধে দেবার অপপ্রয়াস! কি কৈফেয়ৎ দেবে সে এখন নিজেকে! কি বলে শান্ত না দেবে সে নিজেকে! কখনো কি ভেবেছিল, জীবন জোয়ারে সুখের তড়ীতে ভাসতে গিয়ে আচমকা অতল তলে তলিয়ে যাবে! যার কূল নেই, কিনারা নেই, নেই বেঁচে থাকার কোনো অবলম্বণ! ভাবতে পেরেছিল কোনদিন, ওর ভালোবাসাকে নতুন রূপ দিতে গিয়ে ওর জীবনে চিরদিনের মতো ছেয়ে যাবে অমাবস্যার কালো রাত!

কি ভয়ঙ্কর চেহারা সুচরিতার! তাকানোই যাচ্ছেনা! ক্ষণপূর্বেও যা কল্পনা করা যায়নি। কিছুতেই মেনে নিতে পাচ্ছে না দিব্যেন্দু। তখনও ওর কানে বাজজে, প্রাণবন্ত সুচরিতার আনন্দোৎচ্ছল হাসি-কলোতান, মধুর গুঞ্জরণ। যে ওর প্রিয়তমা,শান্ত-স্নিগ্ধ-কোমনীয় এক উদ্বিগ্ন যৌবনা অনন্যা! প্রেমের মহিমায় দ্বীপ্ত মমতাময়ী বিদূষী নারী, হৃদয়হরিনী! দিব্যেন্দুর নিবেদিত প্রাণ, শক্তির উৎস! ওর প্রেরণা, ভাই-বন্ধু-প্রেয়সী, সব!

আজ সুচরিতার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকানো যায়না। হারিয়ে গেছে ওর দৃষ্টিশক্তি, বাকশক্তি। বিকৃতি চেহারা আর বিকলাঙ্গ শরীর নিয়ে নীরব নিরবিচ্ছিন্ন একাকী নির্জন সন্ধ্যায় নিথর নির্জীব প্রাণীর মতো উইল্‌চেয়ারে বসে থাকে ব্যালকনিতে। ফিরে তাকায়, অতীতের সেই আনন্দমুখরিত চঞ্চল প্রবাহিত জীবনের দিকে। আর সেই নীরব নিস্তব্ধতার ভিতর থেকে বারবার বেরিয়ে আসে একটা ক্ষীণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস। যখন বিচ্ছিন্ন মনটা ওর গভীর তন্ময় হয়ে বিচরণ করে, পিছনে ফেলে আসা এক অনবদ্য স্মৃতিবিজড়িত বিশাল উপত্যকায়। আর ক্ষণে ক্ষণে মনঃশ্চক্ষে ভেসে ওঠে, উচ্ছাসিত দিব্যেন্দুর হাস্যোৎজ্জ্বল প্রসন্ন মুখখানা। যা কখনো আর ফিরে আসবে না! অট্টালিকার মতো এতবড় দালান বাড়িটা মানসিক শূন্যতায় শ্বশ্মানপুরীর মতো খাঁ খাঁ করে। হাহাকার করে ওঠে বুক। তখন ওর মনে হয়, প্রিয়জনের একটু সমবেদনা সহানুভূতি বা দর্শণ যেন ধূসর মরুভূমির বুকে এক পশলা বৃষ্টির মতো। এ যেন জীবন্ত লাশ হয়ে বেঁচে থাকা। এক ধরণের বৈধব্য জীবনযাপন করা। আবর্জনার মতো ঘরের কোণায় পড়ে থাকা। যার রূপ নেই, রং নেই, প্রাচুর্য্য নেই, স্বপ্ন নেই, আশা নেই, নেই কোনো ভবিষ্যৎ! শুধু রুটিনমাফিক একঘেয়ে নিরানন্দের জীবন! কি দূর্বিসহ! যেন নির্বাসিত জীবন! অবসন্ন ব্যাথাতুর দেহটা বহন করার মতো ক্ষমতা টুকুই ওর নেই। দিব্যেন্দুকেও প্রাণের ডোরে বেঁধে রাখার মতো আজ ওর কিছুই নেই, সব শেষ!

পশ্চিম দিগন্তের প্রান্তে ক্লান্ত সূর্য্য ঢলে পড়লেই মনের ঘরটা গভীর অন্ধাকারে ছেয়ে যায়। ওতেই বিলীন হয়ে ভুলে যেতে চায় ওর অতীতকে। তবু কাঙ্গাল মন মানতে চায়না। অতীতের আনন্দঘন মুহূর্ত্যগুলি বার বার স্মৃতির গ্রন্থি থেকে ফিরে আসে ওর কল্পনায়। যা ওর বেঁচে থাকার একটা উপকরণ মাত্র। কখনো কি ভাবতে পেরেছিল, বিনা নোটিশে জীবনে এতবড় সর্বণাশ ঘটবে! এতবড় একটা ভয়ঙ্কর বিপর্যয় নেমে এসে ওদের সুখের সংসারটাকে গ্রাস করবে! ভাবতে পেরেছিল কোনদিনও, অমাবস্যার চাঁদের মতো জীবনের সব সুখ-শান্তি-আনন্দ-হাসি-কলোতান চিরতরে কালো অন্ধকারে হারিয়ে যাবে!
ভাবতে বড় কষ্ট হয় সুচরিতার। ওর বুক ভাঙ্গা কষ্টগুলিই তরল হয়ে অঝোর ধারায় দু'চোখ বেয়ে ঝোরে পড়ে। পারে না সম্বরণ করতে। আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একান্তে নৈঃশব্দে বসে বসে কেঁদে ওঠে।

নজর এড়ায় না দিব্যেন্দুর। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে ড্রইং-রূম থেকে পলকমাত্র দৃষ্টিপাতে লক্ষ্য করে, বিষন্নতায় ছেয়ে আছে সুচরিতার শরীর ও মন। কয়েক মাসেই অনেক বুড়িয়ে গেছে। চোখমুখও শুকিয়ে ওকে পুতুলের মতো দেখাচ্ছে। সারাক্ষণ কি যেন ভাবে। যেন ওর অভিশপ্ত জীবন। দৃষ্টিহীতার গ্লানিতে জীবনের প্রতি কোনো আসক্তিই নেই! নেই কোনো স্পৃহা, মোহ। অথচ শ্বাস প্রঃশ্বাসের উষ্ণ অনুভূতি ও পদাচরণে দিব্যেন্দুর উপস্থিতি টের পাওয়া মাত্রই উইলচেয়ারটা টেনে দ্রুত সন্নিকটে এগিয়ে আসে। হাতের ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করতে চায়। দিব্যেন্দুর

মুখমন্ডলে কোমল স্পর্শে হস্ত সঞ্চালণ করে অনুভব করার চেষ্টা করে ওর অন্তর্নিহীত প্রতিক্রিয়া। ওর মানসিক অবস্থান। তখন বিষন্ন হলেও ক্লান্ত চোখের তারায় অস্ফূট একটা হাসির ঝিলিক দিয়ে ওঠে দিব্যেন্দুর। কিন্তু পারে না তা দীর্ঘস্থায়ী করতে। ওযে অঙ্গীকার বদ্ধ! কর্তব্যের কারাগারে বন্দি! শুধুমাত্র দায় সাড়া নয়, সমবেদনাও নয়! গৃহপরিচারিকা চম্পারানী ওর দেখভাল, সেবা-শুশ্রূষায় করলেও এতটুকু ত্রুটি ও রাখেনি। ওর অকুণ্ঠ হৃদয়ের উজার করা নীরব ভালোবাসায় প্রিয়তমা সুচরিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের দৃঢ় অঙ্গীকারে বুকের সমস্ত কষ্টগুলিকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে, ঐ এক ঝলক বিষন্ন হাসির আড়ালে। যে ভালোবাসা জড়িয়ে আছে এবং থাকবে, ওর স্মৃতির গ্রন্থিতে, এক অদৃশ্য অনুভূতিতে। অন্তত স্পর্শকাতর সুচরিতা এটুকুই জানুক, এতো কিছুর পরও ওর প্রতি দিব্যেন্দুর ভালোবাসা এতটুকু কমে যায়নি। অথচ নিজে বিরহের আগুনে দগ্ধ হতে হতে আজ ওর শরীরে কিছু নেই। কঙ্কালের মতো হাঁড়গুলিসব বেরিয়ে এসেছে। মরে গেছে বেঁচে থাকার সাধ। তন্মধ্যে পাথরের মূর্তির মতো দৃষ্টিহীন সুচরিতার গভীর সংবেদনশীল মুখের দিকে তাকালেই বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। আর সেই বেদানুভূতির তীব্র দংশণে মস্তিস্কের সমস্ত স্নায়ূকোষগুলিকে যেন কুঁরে কুঁরে খায়। অত্যন্ত পীড়া দেয় ওর মুমূর্ষ্য হৃদয়কে। আজ ওর অনুতাপ আর অনুশোচনার অন্ত নেই। হারিয়ে ফেলেছে মনের শক্তি। শুধু ভাবে, রাতের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো সুচরিতার চোখের তারাদু'টিতে কখনো কি দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসবে! পারবে ও' ফিরিয়ে দিতে!
কোনদিনও না! শুধু নীরবে নির্বিকারে বুকের মাঝারে জমে থাকবে, সুচরিতার অসংখ্য না বলা কথা, কথার আলাপন। আর অহরহ কানে বাজবে, খুশীর বন্যায় প্লাবিত করা ভ্রমরের মতো ভেসে বেড়ানো সুচরিতার গুনগুন গুঞ্জরণে অপূর্ব সুরের মূছর্ণা।

কিন্তু কতক্ষণ! পড়ন্ত বেলার শেষে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই ওর সমগ্র হৃদয়প্রাঙ্গন জুড়ে সেই ধূসর মরুভূমি! শূন্যতা, হাহাকার! জ্বলে ওঠে কামনার আগুন। যখন গুমড়ে গুমড়ে কেঁদে মরে, ওর নীরব ভালোবাসা, ওর ইচ্ছা-আবেগ-অনুভূতি। কেঁদে মরে একান্তে নিঃভৃতে, কখনো গহীন নিশীথে।

সমাপ্ত

৬ই আগষ্ঠ, ২০১০

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরন্টো প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।
jbarua1126@gmail.com